সংশোধিত

মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিকজাদুঘরেরহিন্দু দেবদেবীপ্রসঙ্গ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান গুলোর মধ্যেমহাস্থানগড় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাস্থানগড়ের পূর্ব নাম পুণ্ড্রনগড়। বর্তমানে স্থানটি বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার সমৃদ্ধিশালী নগরী হিসেবে এর খ্যাতিছিল। প্রাচীনকালেমহাস্থানগড় বাংলার রাজধানী ছিল।ধারাবাহিকভাবেএখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের নৃপতিরা প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবেও বিশ্বব্যাপী এই স্থানটির উল্লেখ পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটকেরা এ অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন এবং এ নগরী সম্পর্কে নানা মন্তব্য করেছেন। এখনও মহাস্থানগড়ের চারপাশে প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক স্থাপনা রয়েছে। এথেকে বোঝা যায় সমগ্র অঞ্চল শহরকেন্দ্রিক ছিল।প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ বৃহত্তর বগুড়া অঞ্চলে অনেক মূল্যবান নিদর্শন পাওয়া গেছে। তাছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে, মন্দিরে মন্দিরে ও ঘরে ঘরে নানাধরনের প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে, সেগুলো সংগ্রহ করে মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই প্রত্নসম্পদের মধ্যে অনেক ভাস্কর্য রয়েছে। এর মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য অত্যন্ত নান্দনিকও উল্লেখযোগ্য। কিন্তুজাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য সম্পর্কে আলাদাভাবে শ্রেণিবিন্যাস ও ক্যাপশনে বিস্তারিত বর্ণনা নেই। এই দেবদেবীর ভূমিকা এবং এর সামাজিকও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যয়ন।এজন্য আলোচ্য প্রবন্ধে মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীরগুরুত্ব এবং ভাস্কর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর ধর্মীয় গুরুত্ব ছাড়াও এর শিল্প-নৈপুণ্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কিত নানা বিষয়ও বর্তমান আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

মহাস্থানগড় জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্যগুলোর বর্ণনা এবং প্রাচীন বাংলার উপর প্রকাশিত বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই মহাস্থানগড়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং হিন্দুধর্মে দেবদেবীর গুরুত্বের বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো –

মহাস্থানগড় বর্তমানে বগুড়া জেলার অন্তর্গত হলেও মহাস্থানগড় নামেই পৃথিবীব্যাপী সমধিক পরিচিত। এটি শুধু বগুড়া জেলাকেই বিখ্যাত করেছেতা নয়, সমগ্র বাংলাদেশকেই বিখ্যাত করেছে। তবে বগুড়া জেলারও অনেক প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। উপমহাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ জেলা হিসেবে বগুড়া সর্বজনবিদিত। ষোড়শ শতকে সুলতান নাসির উদ্দিন বগড়ার নামানুসারে জেলাটির নামকরণ করা হয়।বর্তমান এই বগুড়া শহর থেকে বারো কিলোমিটার উত্তরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। করোতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে চার দিকে উঁচু প্রাচীর বিশিষ্টমহাস্থানগড়ের আয়তন ১৫১৫ মিটার × ১৩৬৩ মিটার। ভূমিভাগ থেকে উচ্চতা ৫ মিটার, তবে কোনো কোনো স্থানে বুরুজের অংশে উচ্চতা ১০ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। বিশাল এই আয়তাকার ভূমিভাগে নানাধরনের স্থাপনা রয়েছে। শাহ্ সুলতান বল্‌খীর মাজার থেকে শুরু করে খোদার পাথর ভিটা, মানকালীর কুণ্ড, জীয়তকুণ্ড, পরশুরামের বাড়ি, পুকুর, বৈরাগীর

ভিটা, মন্দির, মঞ্চ, মুনির ঘোন, দুর্গ, শীলা দেবীর ঘাট, গোবিন্দ ভিটা প্রভৃতি।এর চারদিকেও নানা স্থাপনা রয়েছে। যেমন – গোকুল মেধ, নেতাই ধোপানীর পাট, পরশুরামের সভাবাটী, স্কন্দের ধাপ, গোপীনাথের ভিটা, ওঝা ধন্বন্তরীর বাড়ি, মঙ্গলকোট, খামার ধাপ, কাঁচের আঙ্গিনা, বিহার গ্রাম, ভাসু বিহার প্রভৃতি। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম সম্প্রদায়ের নানা নিদর্শন রয়েছে। সেগুলো মহাস্থান জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

প্রাচীনকালে বাংলা নামে কোনো অখণ্ড জনপদ ছিল না। সমগ্র বাংলাকে প্রধান সাতটি জনপদে বিভক্ত করা হয়। যেমন – পুণ্ড্র, বঙ্গ, গৌড়, সমতট, হরিকেল, বরেন্দ্র, রাঢ়। বগুড়াপুণ্ড্র অঞ্চলের অন্তর্ভূত ছিল এবং সর্বপ্রাচীন জনপদ বলেও অনুমিত। উত্তর বাংলার প্রাচীন নামও পুণ্ড্র।পুণ্ড্র শব্দের অর্থ হলো – 'ইক্ষুভেদ অপর অর্থে দেশবিশেষ, জাতিবিশেষ'[১] ।অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুণ্ড্র অর্থে একই মত পোষণ করে বলেছেন – 'পুণ্ড্র জাতি ও দেশ উভয় সংজ্ঞক শব্দ।[২]বর্তমান বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর জেলা নিয়ে পুণ্ড্র জনপদ ব্যাপৃত ছিল। পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়। আর এ অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ও রাজনীতির অনন্য ক্ষেত্র। পুণ্ড্র নগর যে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল সেসম্পর্কে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন – *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পুরাণ* এবং কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*, সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*, কলহণের *রাজতরঙ্গিণী* প্রভৃতিগ্রন্থে প্রাচীন ওবিখ্যাতনগরহিসেবে পুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াওবিভিন্ন শিলালিপি, লেখমালা, রাজকীয় অনুশাসনে পুণ্ড্র সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। এ অঞ্চলের গুরুত্ব প্রকাশ করে মনীষীগণ নানাধরনের মন্তব্য করেছেন –

ইতিহাসবিদ আর. সি. মজুমদারের মতে –

> The *Digvijaya*section of the *Mahabharata* place them to the east of Monghyr and associates them with the prince who ruled on the banks of the Kosi. This accords with the evidence of Gupta epigraphs and the records of the Chinese writers which agree in placing the territory of the Pundras –them styled Pundravardhana – in North Bengal.[৩]

দীনেশ চন্দ্র সরকার পুণ্ড্র সম্পর্কে বলেন –
পালসম্রাজ্যের অবনতির যুগে ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল বাদে বাংলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ অংশকে পুণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্ধন, পৌণ্ড্র,অথবা পৌণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তির অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪]

এছাড়াও বিভিন্ন তাম্রশাসনে পুণ্ড্র সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়।চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত গুপ্তযুগের দামোদরপুর তাম্রশাসনেপুণ্ড্রের উল্লেখ রয়েছে। তখন পুণ্ড্র ছিল বাংলার গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র। সমতট তার সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত রাষ্ট্র ছিল। 'দশম শতকেধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্ড্র ছিল পালসাম্রাজ্যের সুবিশাল নগর'। ১৯৩১ সালে মহাস্থানগড় ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া যায়। এ ব্রাহ্মীলিপিতে পুণ্ড্রনগরের বিখ্যাত মৌর্য সম্রাট অশোকেরশাসনকালে প্রজাদের দুর্দিনে দানশীলতার পরিচয় মেলে।ষষ্ঠ শতকে পর্যটক উয়ান-চোয়াঙ্ পুণ্ড্রবর্ধন পরিভ্রমণ করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং বাংলা ভ্রমণকালে পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন। তিনি গঙ্গা নদী পেরিয়ে পুন্নাফতনন বা পুণ্ড্রনগরে এসে পৌঁছেছিলেন। তখন এ অঞ্চল সমুদ্রের নিকটে, নিচু ও আর্দ্র ছিল। বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে ৫.৫ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট রাজধানীর চিত্রও তিনি তুলে ধরেন। ১৮৮০ সালে স্যার আলেকজেন্ডার কানিংহাম মহাস্থানগড় পরিদর্শন করেন। তিনি এ স্থান সম্পর্কে বলেন –

It was a origianally surrounded by a broad ditch on the north, south and west sides and was no doubt protected by the Karotoya River on the east, as the low lands come right upto the foot of the rampart.[৫]

প্রত্নতত্ত্ববিদ আ কা ম জাকারিয়া বলেন – এ পর্যন্ত অবিষ্কৃত নগরীগুলোর মধ্যে এটিকে সবচেয়ে প্রাচীন নগরী বলা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রলিপি এবং গ্রন্থাদিতে বর্ণিত বিখ্যাত পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগরই বর্তমান কালে মহাস্থান নামে পরিচিত।[৬]

নাজিমুদ্দিন আহমেদের বর্ণনা মতে, পুণ্ড্রবর্ধন সমগ্রবাংলার প্রাচীন নগরী। প্রাচীন বহু সাহিত্যগ্রন্থ ও লিপিমালায় এর উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে এটি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শাসনকেন্দ্রই ছিল না বরং ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যেরও অন্যতম কেন্দ্ররূপে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেছিল।[৭]

আলোচনার এই পর্বে হিন্দুদের দেবদেবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো –
'দিব্' ধাতু থেকে দেবদেবী বা দেবতা শব্দটি এসেছে। দিব্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি বা জ্যোতির প্রকাশ। 'দেব' পুরুষ বাচক আর 'দেবী' স্ত্রী বাচক। ঈশ্বর যখন নিজের গুণের মাধ্যমে কোনো রূপ বা বিগ্রহ ধারণ করেন তখন তাঁকে দেবতা বলে। যেমন – সৃষ্টিকর্তা রূপেব্রহ্মা। পালনকর্তা রূপে বিষ্ণু। ধ্বংসকর্তা রূপে শিব। এভাবে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা জানা যায়।কারো কারো মতেতেত্রিশ কোটি নয় তেত্রিশ ধরনের দেবতা হিন্দুধর্মে উল্লেখ আছে। অন্যভাবে বলা হয়েছে –

> *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *পুরাণ*-এর অনেক চরিত্র দেবদেবী হিসেবে পূজিত। ভক্তগণ মনের সকল অভিলাষ পূর্ণ করার প্রয়াসে মূর্তিতে যুগ যুগ ধরে পূজা করে আসছেন। হিন্দুধর্মে তিন প্রকার দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা – (১) বৈদিক দেবতা (২) পৌরাণিক দেবতা ৩. লৌকিক দেবতা। বেদে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁদের বৈদিক দেবতা বলে। যেমন – অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, রুদ্র, বরুণ, বায়ু, সোম প্রভৃতি। বৈদিক দেবী হিসেবে সরস্বতী, ঊষা, অদিতি, রাত্রি প্রভৃতি। বৈদিক দেবতাদের কোন মূর্তি ছিল না। দেবতাদের শরীর ছিল মন্ত্রময়। বেদে দেবতাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা –(ক) স্বর্গের দেবতা (খ) অন্তরীক্ষের দেবতা (গ) মর্ত্যের দেবতা। যে দেবতারা স্বর্গলোকে অবস্থান করেন তাঁরা স্বর্গের দেবতা, যেমন – সূর্য, যম, বরুণ প্রভৃতি। স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা অন্তরীক্ষের দেবতা। যেমন – ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি। মর্ত্যে বা পৃথিবীতে যে দেবতারা অবস্থান করেন তাঁরা মর্ত্য লোকের দেবতা। যেমন – অগ্নি। পুরাণে যে সমস্ত দেবতার বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। যেমন – ব্রহ্মা, শিব, গৌরী, সরস্বতী প্রভৃতি। পুরাণে বৈদিক দেবতাদের অনেকের রূপের পরিবর্তন ঘটেছে, অনেক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। পৌরাণিক যুগ থেকেই দেবতাদের বিগ্রহ বা মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। ধ্যানলব্ধ দেবতাদের তৈরি করা হয়েছে ধ্যানানুযায়ী মূর্তি। বেদের বিষ্ণু দেবতা পুরাণে বিভিন্ন অবতার হিসেবে শঙ্খ-চক্র-গদা- পদ্মধারীরূপে দেখা যায়। এছাড়াও সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতার কথা পুরাণেওউল্লেখ রয়েছে। মন্ত্রে যেভাবে দেবদেবীরবর্ণনা করা হয়েছে, সেভাবে তাঁদের মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগে মন্দির নির্মাণ করে তাতে দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করে পূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বেদে ও পুরাণে যে সমস্ত দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন – মনসা, নন্দী, কন্যাকুমারী, শীতলা, ক্ষেত্রদেবতা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি। পরবর্তীকালে মনসা দেবীসহ আরও অনেক লৌকিক দেবতা পুরাণেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৮]

তবে মহাস্থানগড়ে যে সমস্ত দেবদেবীর ভাস্কর্য রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, যেমন – অগ্নি, সূর্য, গোপাল, বিষ্ণু, দাত্তাত্রেয়, হরগৌরী, অম্বিকা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নন্দী, মনসা, অম্বিকা, নৈঋত, যোগিনী তারা, বরাহাবতার, কন্যাকুমারী, গড়ুর প্রভৃতি। এখানে বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক এই তিন শ্রেণির হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিই রয়েছে।

বিভিন্ন মনীষী এই মূর্তি তৈরির পেছনে নানা মত ব্যক্ত করেছেন। দেবদেবী ও ভাস্কর্যের গুরুত্বের কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে – দেবমানব স্বর্গ-মর্ত্য বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য, ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।[৯] প্রত্নতত্ত্ববিদ মোঃ মোশারফ হোসেনের মতে – যুগ বিবর্তনের সাথে সাথে তাদের সংস্কৃতি বলয়ে উর্বরতা চর্চাকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে হাজারো দর্শনের গ্রন্থন-মন্থন অব্যাহত ছিল। আর ঐসব দর্শনের আবহে লালিত করে এই মানুষেরা পালাক্রমে অগুণিত বৈচিত্র্যময় মূর্তি গড়েছে।[১০]
অপরপক্ষে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মনে করেন –সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই অধিকারভেদে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ অনুসারে দেবমূর্তি গড়ে উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।[১১]

মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষিত হিন্দু দেবদেবীর পরিচিত, ধর্মে তাঁদের গুরুত্ব ও বিবিধ প্রসঙ্গঃ

এখানে প্রথমেই মহাস্থান জাদুঘরের সংক্ষিপ্তপরিচিতি তুলে ধরা হলো –
প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গই পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ অঞ্চল। যেমন – বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ। তবে বিশেষ করে মহাস্থানগড় এবং এর চারপাশের স্থাপনা খননের ফলে নানা ধরনের প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ এবং জনগণের মাঝে প্রদর্শনের জন্য ১৯৬৭ সালে মহাস্থানগড়ের উঁচু এলাকায়'মহাস্থানগড় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাদুঘরটি মহাস্থানগড়ের দক্ষিণ সীমান্তে গোবিন্দের ভিটার সন্নিকটে অবস্থিত। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবেমহাস্থানগড়কে ডানে রেখে পূর্বমুখী করে অবস্থিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তিন একর জায়গার উপর নির্মাণ করা হয় বর্তমানে বর্ধিত হয়ে দশ একরে সম্প্রসারিত হয়েছে।জাদুঘর ভবনটি ১৩৬মি.x২৩মি. x ৬১মি. পরিমাপের ৪৪টি সোকেজে দেয়ালের সাথে লাগানোভাস্কর্যসহ প্রত্নসম্পদগুলো রয়েছে। প্রবেশদ্বারের বামদিক থেকে প্রদর্শিত একটি আধারে সোকেজ নম্বর এক থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমানুসারে চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রবেশদ্বারের ডানে দিকে গিয়ে মোট ৪৪ টি প্রদর্শনী শোকেস দিয়ে শেষ হয়েছে।৪৪ টি প্রদর্শিত শোকেজ বাইরেও মাঝে মাঝে কিছু অতি আকর্ষণীয় প্রত্নসম্পদও রয়েছে। তবে জাদুঘরেপ্রদর্শিত মোট ৬৩টি ভাস্কর্য রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান দেবদেবীরভাস্কর্যসম্পর্কে আলোচনা করা হলো –

সূর্য

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অনেক ধর্মের লোকজন সূর্যের পূজা করত।ঋগ্বেদে সূর্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। জাদুঘরের প্রদর্শিত তথ্যানুসারে – সূর্য মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১২]সূর্য দেবতা অনেক নামে স্তুত হন। যেমন – বিবস্বান, সবিতা, আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, পূষা, অর্যমা, মাতরিশ্বা, উষা, ভগ, মিত্র প্রভৃতি । তিনি জগতের শক্তির উৎস এবংসমস্ত জীবের প্রাণ স্বরূপ।

তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, জ্যোতির প্রকাশক, চক্ষুস্বরূপ। চক্ষুস্বরূপ বলতে মহাবিশ্বের সকল কিছুর প্রকাশক। সূর্য দেবতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষলোকে বিরাজিত । *বেদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *পুরাণে* সূর্যের উল্লেখ আছে। *রামায়ণ* ও *মহাভারত* অনুসারে সূর্যের পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতি, স্ত্রী বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা। তাঁদের বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামে তিন সন্তান। পুরাণানুসারে সূর্যের রূপের বৈশিষ্ট হলো – দুই হাত বিশিষ্ট্য, ঘোড়াটানা রথে ধাবমান, পায়ে বুটজুতোএবং দেহে রাজকীয় পোশাকপরিহিত।যুগে যুগে স্থানে স্থানে সূর্যের মূর্তিতে নানা রূপ দেখা যায় –' গুপ্তপূর্ব যুগের নিদর্শনগুলোতে তাঁর গায়ে থাকত কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত ঝুলে থাকা কুর্তা। কিন্তু গুপ্ত আমল থেকে তাঁর বেশভূষার প্রকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে।গুপ্ত আমলে বুকে আড়াআড়িভাবে বেল্টসহ কোমরে ছোড়া বা তলোয়ার ঝুলে থাকতে দেখা যায়। তাঁর পায়ের দু'পাশে থাকে ভূদেবী মহাশ্বেতা বা পৃথিবী, ছায়া, সঙ্গা, নিক্ষুভা প্রভৃতি নামের স্ত্রী মূর্তি। এছাড়া বিভিন্ন যুগে সূর্যমূর্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।'[১৩]ভারতে বিশেষ করে উরিষ্যা, গুজরাট, কর্নাটকেঅনেক সূর্য মূর্তি ও মন্দির রয়েছে। আগের দিনের মতো সম্প্রতি সূর্যপূজা বহুলভাবে প্রচলিত নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে মারোয়ারি সম্প্রদায় আড়ম্বরপূর্ণভাবে সূর্য পূজা করে থাকেন। সূর্যের আলো ও উষ্ণতা প্রাণিকুলের জন্য বড়ই উপকারী। প্রতিদিন সকালে সূর্যকে প্রণাম করা নিত্যকর্মের অংশ।

চিত্র:সূর্য

অগ্নি

ঋগ্বেদ-এর অন্যতম প্রধান দেবতা অগ্নি।জাদুঘরের বর্ণনানুসারে – অগ্নি মূর্তিটি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের তৈরি। ঐতিহাসিক স্থান মহাস্থানগড় খননের ফলে মূর্তিটি পাওয়া গেছে।মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৪]অগ্নির বন্দনার মাধ্যমে ঋগ্বেদ আরম্ভ (১/১) এবং সমাপ্ত(১০/১৯১) হয়েছে। এখানে প্রায় ২০০ সূক্তে তাঁর স্তব করা হয়েছে। নিরুক্তকার যাস্ক অগ্নিকে মর্ত্য লোকের দেবতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর্যগণ প্রাচীন কাল থেকে অগ্নির উপাসনা

করতেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অগ্নির ব্যবহার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আদিম যুগ থেকে অগ্নির ব্যবহার শুরু হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। আদিম মানুষ প্রকৃতির নানা বিপর্যয় ও হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্নি ব্যবহার করত। সেই থেকে তারা মনে করত অগ্নিই তাদের আত্মরক্ষার মূল অবলম্বন। সেই ভাবনা থেকেই তারা অগ্নি দেবের পূজা করে আসছে। তাই পার্থিব জগতের দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই প্রধান। তিনি যজ্ঞের অগ্নিরূপে পূজিত হয়ে আসছেন। বেদে অগ্নি হব্যবহ নামে পরিচিত। কেননা দেবতাদের উদ্দেশে যে আহুতি দেওয়া হয় তা অগ্নিই গ্রহণ করেন। বিবাহের সময় অগ্নি সাক্ষী করে বিবাহ করা হয়। *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *পুরাণে* অগ্নি সম্পর্কে অনেক কাহিনি রয়েছে। অগ্নি – অনল, পাবক, হুতাশন, বহ্নি, বৈশ্বানর, সর্বভুক প্রভৃতি নামে পরিচিত।

চিত্রঃঅগ্নি

বিষ্ণু

সকল সৃষ্টির রক্ষাকর্তা বিষ্ণু। *ঋগ্বেদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* এবং পুরাণে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – বিষ্ণুর দু'টি মূর্তি রয়েছে। প্রথমটি খ্রিষ্টীয় একাদশ এবং দ্বিতীয়টি দ্বাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – প্রথমটি মহাস্থানগড় এবং দ্বিতীয়টি আদমদিঘী বগুড়া। মূর্তিদুটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৫] বিষ্ণুর পিতা কশ্যপ মাতা অদিতি। স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ভাগবতে তাঁর দশাবতারের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন – মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।তাঁর একমুখ ও চার হাত। চার হাতে চার ধরনের অস্ত্র দেখা যায়। যেমন – শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, গদা, পদ্ম। প্রাচীন বিভিন্ন লিপিতে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বোঝা যায় তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়েছেন। সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য তিনি অসুরদের বিনাশ করে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর পরিধানে থাকে –'ধুতি, মাথায় মুকুট ও বক্ষে কৌস্তুব। তাঁর বাহন গরুড়। *বৃহৎসংহিতার* বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বুকে থাকে শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি। কাশ্মীর ও নেপালে চারমাথা চারহাত বিশিষ্ট বিষ্ণুর নিদর্শন আছে। আবার নেপালে দু'হাতবিশিষ্ট বিষ্ণুর

অস্তিত্বও দেখা যায়।[১৬]পুরাণানুসারে তিনি অসুরদের কাছ থেকেত্রিপদভূমি গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বভুবণ পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। তাঁর ভক্তদের বৈষ্ণব বলা হয়।

চিত্র:বিষ্ণু

গোপাল

মহাবতার শ্রীকৃষ্ণের বাল্য নাম গোপাল।তিনি মূলত বিষ্ণুর অবতার। জাদুঘরে প্রাপ্ত বর্ণনানুসারে – গোপালের মূর্তিত্রয় খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – বগুড়ার শিবগঞ্জ। মূর্তিত্রয় কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৭]শ্রীকৃষ্ণের ১০৮ টি নামের মধ্যে আহ্লাদিনী গোপাল নামটি রেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি আশ্চর্যজনক। মহাস্থান জাদুঘরে গোপালের তিনটি মূর্তি রয়েছে। প্রথমটি ও তৃতীয়টি ননীগোপাল, দ্বিতীয়টি বেনুগোপাল। তিনটি মূর্তিই রূপভেদে আলাদা।ভাগবতে তাঁর বাল্যলীলায় দেখা যায় এ রূপ অবলোকন করতে স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নারদাদি দেবতা উন্মুখ হয়ে গোকুলে চলে এসেছেন। এখানে বাৎসল্য রসের এক চমৎকার পরিস্ফুটন ঘটেছে। গোপাল বসুদেব ও দেবকীর গর্ভে মাতুলালয়ে মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন পরে পিতা বসুদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে মানব দেহ ধারণ করে দ্বিভুজ বিশিষ্ট হলেন। বাল্যকাল থেকেই গোপাল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে নিরত থেকেছেন। এ সময় পুতনা রাক্ষসী বধ, অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ করতে দেখা যায়। এছাড়া গোপালনে ব্যাপৃত থেকে গোপ-গোপী ও সখাদের নিয়ে খেলার ছলে গোকুলে নানা ধরনের বাল্যলীলা-মাধুর্য প্রকাশ করেন।

চিত্র:গোপাল

দত্তাত্রেয়

পরমেশ্বর বিষ্ণুর আরেকটি বিশেষ রূপ হলো দত্তাত্রেয়। জাদুঘরের বর্ণনানুসারে – মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দশম শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – বগুড়া। এটি বগুড়া র‍্যাব বারো এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।[১৮] দত্তাত্রেয়ের পিতার নাম অত্রি আর মাতার নাম অনসূয়া। সতী-সাধ্বী অনসূয়ার গর্ভে বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে আবির্ভূত হন। কাহিনি অনুসারে – কুশিকবংশে অত্রি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ছিলেন। পরম সতী-সাধ্বী স্ত্রী অনেক কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে স্বামীর সেবা করতেন। একদিন স্বামী এক পতিতা নারীকে দেখে কমাসক্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি স্ত্রীকে অনুরোধ করেন সেই পতিতার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে কাঁধে নিয়ে সে পতিতার গৃহাভিমুখে চললেন। রাতের বেলায় অন্ধকারে যাওয়ার পথে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য মুনির গায়ে পদস্পর্শ হওয়ায় তিনি অভিশাপ দিলেন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তার স্বামীর মৃত্যু হবে। এই নিদারুণ অভিশাপ সতী-সাধ্বী স্ত্রী শোনার পর বললেন যেতেতু সূর্যোদয়ই আমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ তাই সূর্যোদয়ই হবে না। কেননা সতী-সাধ্বী স্ত্রীর বাক্য অভ্রান্ত। সূর্যালোকের অভাবে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় পৃথিবী ধ্বংসের পথে। তখন দেবতারা একত্রিত হয়ে ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা বললেন পতিব্রতের মাহাত্ম্যের জন্যই সূর্যের উদয় হয়নি। ব্রহ্মার পরামর্শে সকলে মিলে অনসূয়ার কাছে গেলেন। তাঁরা অনসূয়াকে সূর্যোদয়ের জন্য অনুমতি দিতে অনুরোধ করেন। যদি সূর্যোদয়ের কারণে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় তবে পুনর্জীবন দান করে নতুন দেহসম্পন্ন করে দিবেন। অনসূয়া সব মেনে নিয়ে সূর্যোদয়ের অনুমতি দিলেন। তখন দেবতারা খুশি হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। তিনি বর প্রর্থনা করলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে পুত্ররূপে পাবার। তখন অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হন।

চিত্র:দত্তাত্রেয়

বরাহ

বরাহ বিষ্ণুর অবতার। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – বরাহ মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় দশম শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[১৯] মানব দেহে বরাহের মাথা সংযুক্ত করে বরাহাবতারের মূর্তি নির্মাণ করা হয়। পুরাণানুসারে সৃষ্টির প্রথমে জগৎ যখন জলময় ছিল।জল প্রশমনের জন্য ব্রহ্মা যখন অত্যন্ত চিন্তিত হন। অন্তর্যামী ভগবান জগতের দুঃখ লাঘবের জন্য বরাহাবতাররূপে আবির্ভূতহলেন।এই সংবাদে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের মুনি-ঋষিরা বরাহরূপী বিষ্ণুকে স্তুতি করতে থাকেন। সকল বিঘ্ন বিনাশীবরাহরূপটি ব্রহ্মার নাশারন্ধ্র থেকে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ নির্গত হয়ে আকাশে উত্থিত হয়ে হস্তীরন্যায় বৃহদাকার রূপ ধারণ করেন। বরাহাবতারের হুংকারে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত হতে থাকে। ধ্যানরত মুনি-ঋষিরা জাগ্রত হয়ে আবার স্তব করতে থাকেন। তারপরে বরাহাবতার ধাবমান হয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য জলের মধ্যে লুকায়িত দৈত্য হিরাণ্যাক্ষকে বধ করেন। পরে পৃথিবীকে দন্তে ধারণ করে ঊর্ধ্বে উত্থিত করে মানবের বসবাসের জন্য উপযোগি করে তোলেন।

চিত্রঃ বরাহাবতার

গড়ুর

গড়ুর বিষ্ণুর বাহন। ঋষি কশ্যপ ও বিনতার পুত্র গড়ুর। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – গড়ুর মূর্তিটি দশম-একাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[২০]গড়ুর পাখিদের রাজা। তার অপর নাম সুপর্ণ। কেননা তিনি ইন্দ্রকে একটি স্বর্ণময় পালক দিয়েছিলেন। *রামায়ণে* দেখা যায়, রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে আবদ্ধ হলে, রাম উদ্ধারের জন্য গড়ুরকে স্মরণ করেন। গড়ুর নাগদের ভক্ষণ করে রাম-লক্ষ্মণকে মুক্ত করে। *মহাভারত*-এর আদি পর্বে প্রথমেই দেখা যায়, কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী কদ্রু ও বিনতা। কদ্রুর গর্ভে এক হাজার নাগ পুত্র হলো আর বিনতার গর্ভে মহাপরাক্রমশালী গরুড়ের জন্ম হলো। গরুড় তার মায়ের দাসত্ব মোচনের জন্য নাগদের নির্দেশে অমৃত আনতে গমন করে। পথে ক্ষুধা নিবারণের জন্য পিতা কশ্যপের কথানুসারে মহাগিরিতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন করে শক্তি অর্জন করে। পরে গরুড় স্বর্গের দেবতাদের পরাজিত করে ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করে অমৃত এনে মায়ের দাসত্ব মোচন করেন।

চিত্রঃ গড়ুর

ব্রহ্মা

ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তার নামব্রহ্মা। জাদুঘরের তথ্যানুসারে তিনটি ব্রহ্মার মূর্তি রয়েছে। সবকটিই খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান –প্রথমটি নওগাঁ, দ্বিতীয়টি পাঁচবিবি জয়পুরহাট, তৃতীয়টি আদমদিঘি, বগুড়া।[২১]ব্রহ্মা থেকেই ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে। *রামায়ণে* ব্রহ্মাই বরাহ মূর্তি পরিগ্রহ করে জগৎকে রক্ষা করেছেন। *মহাভারতে* বলা হয়েছে – ব্রহ্মা সকল প্রাণীর নমস্য, তাঁকে অনেক নামে ডাকা হয়েছে। যেমন – অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, সকলের প্রাণ, অযোনিসম্ভব, জগন্নাথ, বেদের জনক, বিষ্ণু, নারায়ণ, উমাপতি, সাবিত্রীপতি, বিরূপাক্ষ, স্কন্দ-সেনাপতি প্রভৃতি। *পদ্মপুরাণে* ব্রহ্মার স্তবে ব্রহ্মাকে সূর্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণ* মতে ব্রহ্মাই নারায়ণ। তিনি মৎস্যাদি অবতাররূপও পরিগ্রহ করেছিলেন। *ধর্মসূত্রে* ব্রহ্মার পাঁচটি নাম। যেমন – ব্রহ্মা, চতুর্মুখ, পরমেষ্ঠী, হিরণ্যগর্ভ ও সয়ম্ভূ। *গৃহ্যসূত্রে* ব্রহ্মার ছয়টি নাম। যেমন – ব্রহ্মা, প্রজাপতি, পরমেষ্ঠী, স্থানু, শিব, শর্ব। ব্রহ্মা সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা হলেও বিভিন্ন বৈদিক দেবতার গুণ-কর্ম সম্মিলিত হয়ে আবির্ভাব ঘটেছে।ব্রহ্মা পূর্বে নিরাকার ছিলেন। পরে আবির্ভূত হলেন। দেবতাদের স্বরূপ বিচারে ব্রহ্মা সূর্যাগ্নির রূপভেদ। তিনি বিমল, স্বর্ণময়, সুন্দর, অগ্নিজ্বলিত শিখার মত উজ্জ্বল। সর্বদিক মুখবিশিষ্ট। তাঁর মুখে অগ্নি, দাঁতে যজ্ঞ, রোমরাজি তৃণের মত। তাঁর দীপ্তি জগৎ সংসারে ব্যাপৃত।তিনি এই পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে আকাশ, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, মেঘ-শিশির, প্রাণিবর্গ প্রভৃতি। সৃষ্টি ছাড়াও ব্রহ্মা নাট্যশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভাবক। ব্রহ্মাকে ধাতা বা বিধাতা এবং সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। তিনি দেবতাদের গুরু। সকল দেবসত্তা ব্রহ্মাতেই একাকার

হয়ে গেছে। কেননা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনে এক, একে তিন। ব্রহ্মার স্বরূপ দিবালোকের মতই জাজ্বল্যমান। ব্রহ্মা দেবতা-দানব-মানবের গুরু-স্রষ্টা-পিতামহ।ব্রহ্মা সৃষ্টি বিস্তারের জন্য প্রথমে তাঁর মানসপুত্র ঋষিদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঋষিরা বংশবিস্তারে মনোযোগ দিলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রথম নারী শতরূপা ও প্রথম পুরুষ সায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করলেন। মানুষ মনুর সন্তান বলে মানব নামে খ্যাত।

চিত্রঃ ব্রহ্মা

হরগৌরী

দেবাদিদেব মহাদেবের অনুরূপ হলেন হর। তিনি ভক্তদের দুঃখ-কষ্ট হরণ করেন।আবার অন্তিম সময়েশিবরূপে তিনি বিনাশ করেন। ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবের পূজা করেন। আর গৌরী হলেন মহাদেবী দুর্গা ওপার্বতীর আরেক নাম। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – হরগৌরীর চারটি মূর্তি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – জয়পুর হাটের বিভিন্ন এলাকা। মূর্তিগুলো কালোপাথর ছেঁটে গড়া।[২২]দানবদের দখলকৃত ত্রিপুর (স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী)ধ্বংসের জন্য দেবতাদের দেওয়া অর্ধেক তেজ ধারণ করে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান হন তখন তাঁর নাম হয়দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁর অপর নাম রুদ্র। রুদ্ররূপে তিনি মহাকাল, ভয়ানক, হিংস্র।বস্তুততিনি কল্যাণের দেবতা। *বেদ* ব্যতীত *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *পুরাণে*তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।তিনি সর্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞ। তাঁর বাহন ষাঁড়। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব –এই ত্রিমূর্তির অন্যতম। তাঁর গায়ের রং শুভ্র। মাথায় জটা। ত্রিনয়ণধারী। কপালের মাঝখানে একটি চোখ রয়েছে। এটিকে জ্ঞান চোখ বলা হয়। আর মাথায় একটি বাঁকা চাঁদ রয়েছে। তাঁর হাতে থাকে ডমরু, শিঙ্গা এবং ত্রিশূল।গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা। সর্প তাঁর গলার ভূষণ। তাঁকেশম্ভু, ত্রিলোকেশ , পিনাকী, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নীলকণ্ঠ, শংকর ইত্যাদিনামে ডাকা হয়।[২৩]আড়ম্বরপূর্ণভাবেফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে তাঁর পূজা হয়ে থাকে। আর গৌরী হলেন ব্রহ্মার মানস কন্যা। জাদুঘরের তথ্যানুসারে –

গৌরী মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়।পরবর্তী জন্মে তিনি হিমালয়ের কন্যারূপে আবির্ভূত হন।তিনি মহাদেবের স্ত্রী।নক্ষত্রের জাজ্বল্যমান দীপ্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেতিনি গৌরীনামে খ্যাত।তাঁর বিভিন্ন নাম –আর্যা, উমা, শ্রী, ভবানী, রম্ভা, চিত্তরূপা, ত্রিপুরা, কন্যাকা প্রভৃতি। পুরাণেগৌরীরদুই হাত, চার হাত এবং দশ হাত বিশিষ্ট রূপে দেখা যায়। এই হাতে ভক্তদের মঙ্গলার্থে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ধারণ করে থাকেন। যেমন – অভয়মুদ্রা, বরদমুদ্রা, জপমালা, পদ্ম, কমণ্ডলু প্রভৃতি। এই মূর্তির দুপাশেকার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী,সরস্বতী ও নট-নটী দেখা যায়।নিচেপায়ের কাছে গোধিকা, সিংহ রয়েছে।ভারতের বিভিন্ন জাদুঘর ও মন্দিরে হরগৌরীর মূর্তি রয়েছে।কোলকাতা জাদুঘরে গৌরীর দুহাত বিশিষ্ট মূর্তি রয়েছে। সম্প্রতি মুন্সিগঞ্জে গৌরী মূর্তি পাওয়া গেছে। গৌরী মঙ্গলময়ী মাতৃরূপে ভক্তদের আরাধ্য।

চিত্র:হরগৌরী

অম্বিকা

দেবী দুর্গার আরেক নাম অম্বিকা। তবে এরূপে তাঁর গুণ-কর্ম-বিভাব আলাদা রয়েছে। তিনি আদ্যাশক্তি, দেবাদিদেব মহাদেবের স্ত্রী। জাদুঘরে তথ্যানুসারে – মূর্তিটি একাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট। মূর্তিটি বেলেপাথর ছেঁটে গড়া।[২৪] দেবী অম্বিকারূপে শুম্ভ ও নিশুম্ভ এবং তাদের অনুচর চণ্ডী-মণ্ডী নামক দৈত্যদের নিধন করে ধরাধামে শান্তি স্থাপন করেছেন। এদের নিধনের ফলে দেবতাদের স্বর্গ রাজ্যও উদ্ধার হয়।তাঁর বাহন সিংহ। শ্বেতাশ্বতর সূত্র অনুসারে তিনি চার হাত বিশিষ্টা। তাঁর চার হাতে থাকে একগুচ্ছ আম, পাখির ঠোঁট, একটি শিশু এবং একটি লাঠি। দিগম্বর সূত্রে দেখা যায় তিনি দুই হাত বিশিষ্টা। এক হাতে থাকে আমের গুচ্ছ এবং আরেক হাতে থাকে শিশু ধরা। উড়িষ্যার পাটনা জাদুঘরেদুই হাত বিশিষ্টা অম্বিকার মূর্তি রয়েছে।

চিত্র:অম্বিকা

গণেশ

সিদ্ধিদাতাহিসেবে গণেশ সর্বজনবিদিত। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – এখানে গণেশের তিনটি মূর্তি রয়েছে। প্রথমটি খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের তৈরি।প্রাপ্তিস্থান – আদমদীঘি, বগুড়া। দ্বিতীয়টিখ্রিষ্টীয় দশম শতকে তৈরি।প্রাপ্তিস্থান – পাঁচবিবি, জয়পুরহাট। তৃতীয়টি খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়।[২৫] প্রথম ও দ্বিতীয় মূর্তিটি নৃত্যরত গণেশ। তৃতীয় মূর্তিটি সাবলীলভাবে অবস্থানরত।*বেদ*, *মহাভারত*, *পুরাণে* তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। *বেদে* তাঁকে গণেশ্বর বলা হয়েছে। *মহাভারতে* গণেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ব্যাসদেবের সর্বপ্রথম কলমধারী তথা লিপিকর হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে গণেশ শিব ও পার্বতীর পুত্র। তবে এখানে বিষ্ণুর বরে তাঁর জন্মের বিবরণও পাওয়া যায়।পুরাণে তাঁর দ্বাদশ নামের উল্লেখ আছে। যেমন – একদন্ত, সুমুখ, কপিল, গজকর্ণ,বিঘ্ননাশক,বিনায়ক, গজানন, গণপতি প্রভৃতি।বিভিন্ন গ্রন্থেতাঁর চব্বিশটি রূপের উল্লেখ আছে।গণেশের রূপের বৈশিষ্ট্য হলো – স্বাস্থ্যবান, খর্বকায়, ত্রিনয়নধারী, হাতির মতো মাথাযুক্ত, অর্ধবৃত্তাকার উত্তল পেট, সাপের কোমর বন্ধ, চার হাত, এক হাতে চক্র, একহাতে শঙ্খ, এক হাতে গদা, অপর হাতে পদ্ম প্রভৃতি। তাঁর বাহন ইঁদুর।[২৬] তিনি গুণ শ্রেষ্ঠ।শনি দেবতার অভিশাপে তাঁর নরমস্তক ছিন্ন হয়। পরে বিষ্ণুর কৃপায় হাতির মস্তক যুক্ত করা হয়। ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছে গণেশ দেবতা প্রিয়। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে অতি আড়ম্বরপূর্ণভাবে গণেশের পূজা করা হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গেও গণেশ দেবতার পূজা হয়ে থাকে।

চিত্র:গণেশ

লক্ষ্মী

ঋগ্বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবতা হিসেবে লক্ষ্মী দেবীপরিচিত। জাদুঘরের প্রদর্শিত তথ্যানুসারে – এখানে দুটি লক্ষ্মীর মূর্তি রয়েছে। প্রথম মূর্তিটি গজলক্ষ্মীর। এটি হালকা ধূসর পাথরে (প্রস্তর) তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – নামুজা, বগুড়া।দ্বিতীয় মূর্তিটি সাধারণ লক্ষ্মী। হাতে চামর ধরা। এটি খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – ঈশ্বরদী, পাবনা। দুটি হস্তীর শুঁর বিশিষ্ট মূর্তি গজলক্ষ্মী।[২৭]লক্ষ্মী পৌরাণিক দেবী হিসেবে স্বীকৃত। তিনি অতুলনীয় সুন্দরী, গৌরবর্ণা। তাঁর দুটি হাত। ডান হাতে পদ্ম ফুল। বাম হাতে শস্যের ছড়া। বাঁ কোলে ধন-সম্পদের পাত্র। লক্ষ্মী দেবী সর্ব প্রকার অলংকারে ভূষিত। মাথায় সোনার মুকুট। তিনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্ট। পুরাণে লক্ষ্মী দেবীর আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে দেখা যায়, লক্ষ্মী দেবীর চার হাত। তাঁর এক হাতে পাশ (দড়ির ফাঁস) ও অক্ষমালা। আরেক হাতে পদ্মফুল ও অঙ্কুশ (হাতি-চালনার দণ্ড)। একটি হাতে স্বর্ণপদ্ম। ডান হাত তুলে তিনি ভক্তকে দান করছেন বর ও অভয়। তাঁর বাহন লক্ষ্মী পেঁচা। তিনি ধন-সম্পদ, সুখ ও সমৃদ্ধি দান করেন। পুরাণানুসারে দেবতা ও দৈত্যেরা মিলে একবার সমুদ্র মন্থন করেন। সেই সমুদ্র মন্থনের সময় লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র থেকে উঠে আসেন। পুরাণে লক্ষ্মীকে নারায়ণের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষ্মী পূজায় ঘণ্টা বাদ্য নিষিদ্ধ। লক্ষ্মী দেবীর পূজা নিত্যপূজা। প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ও রাতে লক্ষ্মী দেবীর পূজা করা হয়। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্মীপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে প্রতিমা নির্মাণ করে আড়ম্বরপূর্ণভাবে পূজা করা হয়। এ পূর্ণিমাকে লক্ষ্মীপূর্ণিমা বা গোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। দুর্গা পূজার সময়ও লক্ষ্মী পূজা করা হয়।তিনি কল্যাণময়ী, শুভফল প্রদায়িনী। সর্বপ্রকারে রক্ষাকারিণী। লক্ষ্মী দেবী ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করেন। তিনি শুধু পার্থিব ধন-সম্পদই দান করেন না, তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরের বিরাটত্ব, মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র সম্ভবা অর্থাৎ তিনি সমুদ্র জাতা। ভাগবতে লক্ষ্মী দেবীকে 'জীবনোপায়রূপিণী' বলা হয়েছে। লক্ষ্মী দেবী

সর্বজীবের জীবন ধারণের জন্য জীবিকার উপায় করে দেন। লক্ষ্মী দেবীর শান্ত ও সৌম্য রূপ মনে শ্রদ্ধা ও প্রশান্তি জাগিয়ে তোলেন। তাই শান্ত-সুন্দর কোনো মেয়েকে 'লক্ষ্মী মেয়ে' বলা হয়। ধর্মগ্রন্থে লক্ষ্মী দেবী নিজেই বলেছেন – ঈশ্বর, পিতা-মাতা, গুরু, অতিথিকে যে বাড়িতে শ্রদ্ধা করা হয় না সে বাড়িতে তিনি কখনও প্রবেশ করেন না। এছাড়া যে বাড়িতে ঝগরাটে, বিশ্বাসঘাতক, কৃতঘ্ন এবং যারা নেই নেই বলে হাহাকার করে এমন লোকের বাড়িতে তিনি যান না। লক্ষ্মী দেবী সন্তুষ্ট হলে জীবন সমৃদ্ধ হয়। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মীর প্রতিমা গড়ে পূজা করেন। বাংলাদেশে তিথি অনুসারে মেয়েরা লক্ষ্মী পূজা করে থাকেন।

চিত্র:লক্ষ্মী

সরস্বতী

ঈশ্বর যে শক্তিরূপে জ্ঞানকে প্রকাশ করেন, তাঁর নামই দেবী সরস্বতী। সরস্বতী জ্ঞানের দেবী, বিদ্যার দেবী নদীস্বরূপা ও জ্যোতিস্বরূপা। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – সরস্বতী মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – আদমদীঘি, বগুড়া। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[২৮]বেদে সরস্বতী দেবীর উল্লেখ আছে। বৈদিক সভ্যতা সরস্বতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বলে এই দেবীর মাহাত্ম্য অনেক। সেখানে তিনি নদী স্বরূপা। নদী ও দেবী রূপে তাঁর নামকরণ করা হয়েছে। পুরাণে সরস্বতী দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সরস্বতী সঙ্গীত, নাট্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি সকল প্রকার সৃষ্টিশীল বা সুকুমার শিল্প এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দেবী। তিনি সকল প্রকার জ্ঞানদানকরেন। সরস্বতী দেবীর গায়ের রং শুক্ল বা শুভ্র। চন্দ্রের মত শোভা তাঁর। শুক্ল তাঁর বসন। সরস্বতী দেবী শ্বেত পদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর হাতে থাকে পুস্তক ও বীণা। বীণা হাতে থাকে বলে সরস্বতী দেবীর আরেক নাম বীণাপাণি। তাঁর বাহন শ্বেতহংস। সবকিছু মিলে সরস্বতী দেবী সর্বশুক্লা। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়। তাই এ তিথিকে শ্রীপঞ্চমী তিথি বলা হয়। দুর্গা পূজার সময়ও সরস্বতী পূজা করা হয়। পুরাণে সরস্বতী বাগ্‌দেবী ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বর্ণিত। সরস্বতী বিশেষভাবে বিদ্যার্থীদের উপাস্য দেবী। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা করা হয়। শিল্পকলার দেবীরূপে সরস্বতী কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, অভিনেতা, নৃত্য শিল্পীসহ কলাকারদের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন। সরস্বতী সর্বশুক্লা,

সুচিতা ও পবিত্রতার প্রতীক। তাই যে জ্ঞান অর্জন করতে চায় তাকেও মনে-প্রাণে শুদ্ধ ও পবিত্র হতে হবে। নইলে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন করা যায় না। সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস। রাজহাঁসকে জল আর দুধ মিশিয়ে দিলে দুধ গ্রহণ করে জল ত্যাগ করে। জ্ঞানী তেমনি জ্ঞানের জগৎ থেকে অসার বস্তু বাদ দিয়ে সার গ্রহণ করেন। সরস্বতী দেবীকে বলা হয়েছে 'জাড্যাপহা'। জাড্য মানে জড়তা। এখানে জাড্য মানে মূর্খতা। অপহা মানে বিনাশকারিণী। সরস্বতী দেবী মূর্খতা দূর করে মন জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেন।পুরাণেসরস্বতী দেবীর কৃতিত্ব ও মাহাত্ম্যের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অনেক সাধারণ ও মূর্খ ব্যক্তি সরস্বতীর কৃপা লাভ করে বিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক হয়েছেন।

চিত্র:সরস্বতী

কার্তিক

কার্তিক হলেন সুদর্শন, দেবসেনাপতি। দুর্গা পূজার সময় দেবীর বাম পাশেধনুর্ধারী রূপে দেখা যায়। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব ও পার্বতীর বীর পুত্র। তাঁর স্ত্রী বল্লী ও দেবসেনা।জাদুঘরের তথ্যানুসারে – কার্তিক মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাদেবপুর, নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[২৯]এটি মুখ থেকে ঊর্ধ্বাংশ ভঙ্গুর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।*মহাভারত* অনুসারে কার্তিকের ছয়টি মাথা, একটি গ্রীবা, একটি উদর। তাঁর বাহন ময়ূর। হাতে তীর ও ধনুক। *পুরাণ* অনুসারে একটি মাথা, দুটি হাত। এক হাতে অভয়মুদ্রা অপর হাতে শক্তি ধারণ করেন। তাঁর দেহে থাকে বীরত্বপূর্ণ ভাবব্যঞ্জনা এবং যৌবনের উচ্ছ্বাস। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে পার্বতীর সাথে বিহারকালে মহাদেব তেজ ধারণ করতে না পারায় পৃথিবীতে পতিত হয়। আবার পৃথিবীও ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নিও সহ্য করতে না পেরে হিমালয়ের পাদদেশে শরবনে পরিত্যাগ করেন। শরবনে এই বীর্য থেকে একটি তেজীয়ান বালকের জন্ম হয়। এই বালকই কার্তিক। পরবর্তীতে পার্বতী এ বিষয় অবগত হয়ে পুত্র স্নেহে লালন-পালন করেন। বিভিন্ন গ্রন্থে কার্তিকের বারোটি রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন – সুব্রাহ্মণ্য, দেশিক- সুব্রাহ্মণ্য, শক্তিধর, সেনাপতি-মিথুন, দেবসেনাপতি, কুমার, সংমুখ, তারকারি, সনৎকুমার, বিশাখা প্রভৃতি।অন্য কাহিনিতে বলা হয়েছে তিনি ছয় কৃত্তিকার সন্তান তাই শরানন। সন্তানহীন মায়েরা

সন্তান লাভার্থে কার্তিক দেবতার পূজা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ পুত্র সন্তান কামনায় কার্তিকের পূজা করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্যদেব ও কুমাররূপে (অবিবাহিত) কার্তিক পূজিত হন।

চিত্র:কার্তিক

নন্দী

নন্দী দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন।আকৃতিষাঁড়ের মতো। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – নন্দী মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাদেবপুর, নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[৩০] পিতার নাম শিলাদ মুনি। স্ত্রীর নাম সূয়শা। তাঁর অন্য নাম নন্দীশ্বর। নন্দীর রূপের বৈশিষ্ট্য হলো – করালদর্শন, বামন, বিকটাকার, মুণ্ডিতমস্তক, ক্ষুদ্রবাহু, মহাবল। নন্দী মহাদেবের প্রধান অনুচর ও গণনায়ক।বাল্যাবস্থা থেকেই নন্দী অন্তিম পর্যন্ত মহাদেবের অর্চনা করে তাঁর গণমধ্যে গণ্য হন। [৩১] শিবপুরাণানুসারে মহর্ষি শিলাদ ছিলেন শিবের এক নিষ্ঠাবান ভক্ত, কিন্তু তিনি ছিলেন পুত্রহীন। সেকারণে তাঁর পিতৃপুরুষ স্বর্গলাভ করতে পারেনি। তাই তিনি শিবের তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে যজ্ঞ করার জন্য হল কর্ষণ করেন। তখন শিবের আশীর্বাদে হল কর্ষণের সময় ক্ষেত থেকে নন্দীর আকৃতির অযোনিসম্ভব এক পুত্র বের হয়ে আসে। পিতা শিলাদ নন্দীর ভাগ্য গণনা করে জানতে পারেন ইনি হবেন শিবেরভক্ত। *রামায়ণ*-এরকাহিনি অনুসারে, রাবণকে একদিন নন্দীবনের মধ্যে ঢুকতে নিষেধ করেন। কারণ সেখানে তখন হর-গৌরী বিহার করছেন। রাবন তখন অপমানিত বোধ করে তাঁকে তাচ্ছিল্য করেন। নন্দী অভিশাপ দেন আমার আকৃতি বিশিষ্ট বানরেরাই তোমাকে হত্যা করবে। এই অভিশাপের ফলেই একদিন রাবণ বংশ ধ্বংস হলো। মহাদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সুয়শার সাথে নন্দীর বিবাহ দেন। প্রায় সব শিব মন্দিওে মহাদেবের মূর্তির সাথে নন্দীর মূর্তি দেখা যায়। বাংলাদেশের মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুরসহ বেশিরভাগ জাদুঘরে নন্দী মূর্তি রয়েছে। তবে মহাস্থানগড়ের

এই মূর্তিটি বেশ নান্দনিক। ভারতে কর্ণাটকের চামুণ্ডী মন্দিরে এবং তামিলনাড়ুর ইসাযোগ মন্দিরে নন্দীর মূর্তি রয়েছে।

চিত্রঃ নন্দী

মনসা

মনসা সর্পকুলের দেবী। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – মনসা মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাদেবপুর, নওগাঁ। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[৩২] সর্প দংশনের হাত থেকে প্রতিকার পেতে, রোগ নিরাময়ে এবং ঐশ্বর্য লাভের ক্ষেত্রে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। তাঁকে কেউ কৃষির দেবীও বলেছেন।মনসা শিব-পার্বতীর কন্যা। আবার কোনো গ্রন্থে তাঁকে কশ্যপের কন্যা বলা হয়েছে। বেদে মনসার উল্লেখ নেই। পুরাণে দেবীর সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা রয়েছে। পুরাণানুসারে তিনি জরৎকারু মুনির পত্নী, আস্তিক্য মুনির মাতা, নাগরাজ বাসুকির বোন হিসেবে পরিচিত।তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বিষহরী, জগৎগৌরী, শৈবী, বৈষ্ণবী, মাগেশ্বরী,নাগেশ্বরী, সিদ্ধযোগিনী, পদ্মাবতী।'এই দেবী অত্যন্ত সুন্দরী বলে এঁর নাম জগৎগৌরী। শিবের কন্যা তাই শৈবী ; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী ; নাগদের প্রাণরক্ষা করে ছিলেন বলে নাগেশ্বরী ; সর্পভয় দূর করেন, তাই তিনি বিষহরী ; মহাদেবের কাছ হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, কশ্যপের মানস কন্যা বলে মনসা।তাঁর মাথার উপর সাধারণত থাকে সপ্তবাসুকি অথবা ত্রয়ীবাসুকি।[৩৩]এখানে মনসা দেবীর মাথার উপরে রয়েছেসপ্তবাসুকি। পায়ের নিচে জলের ঘট। দুহাত বিশিষ্টমূর্তিতে বাম হাতে সর্পও ডান হাতে শিশু রয়েছে। তবে মূর্তিটির মুখমণ্ডল ভঙ্গুরবাংলাদেশের বরিশালে আগৈলঝাড়ায় মনসা মঙ্গলের রচয়িতা বিজয় গুপ্তের বাড়িতে পিতলের বড় মনসা মূর্তি দেখা যায়। কলকাতার জাতীয় জাদুঘরে ও বীরভূমে এবং ব্রিটিশ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় মনসার মূর্তি রয়েছে।

চিত্রঃ মনসা

নৈঋত

আটটি দিকের মধ্যে নৈঋত একটি। জাদুঘরের তথ্যানুসারে – নৈঋত মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – মহাস্থানগড়। মূর্তিটি কালো পাথর ছেঁটে গড়া।[৩৪] জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিদেবতা নৈঋত। এই দেবতা সংসারের স্বামী-স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব-কর্তব্য প্রভৃতি প্রতিপালনীয় বিষয়কে প্রভাবিত করেন। নৈঋতের বাহন ভূত বা মৃত দেহ। তাঁর এক মাথা, দুই হাত। এক হাতে গদা অপর হাতে ধনুক। তাঁর পোশাক বাঘের চামরা দিয়ে তৈরি। কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর বাহন ভালুক ও হাতে গদা থাকার কথা উল্লেখ আছে।

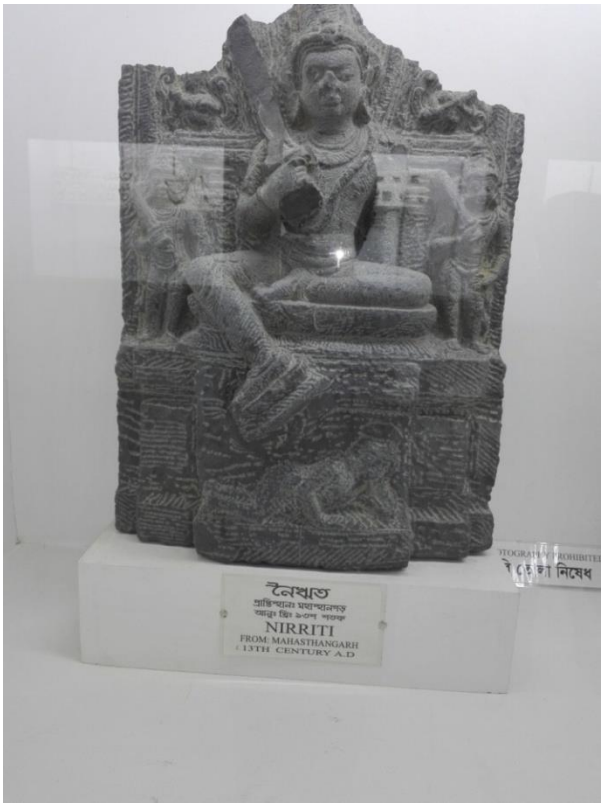

চিত্রঃ নৈঋত

যোগিনী তারা

দেবী যোগিনী দুর্গা বা পার্বতীর সহচরী।জাদুঘরের তথ্যানুসারে – যোগিনী মূর্তিটি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে তৈরি। প্রাপ্তিস্থান – খঞ্জনপুর, জয়পুরহাট। মূর্তিটি ধূসর বর্ণের পাথর ছেঁটে গড়া।[৩৫]পৌরাণিক শাস্ত্রে চৌষট্টি যোগিনীর উল্লেখ আছে।যেমন – জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, ঈশ্বরী, শাকম্ভরী প্রভৃতি। যোগিনীরা দেবী দুর্গার নির্দেশ পালনকারী ও সাহায্যকারী। দুর্গা পূজার সময় যোগিনীদের পূজা করা হয়। অঞ্জলি প্রদান কালে যোগিনীদের নাম উল্লেখ করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে যোগিনী চক্র রয়েছে। যেমন – প্রতিপদ নবমীতে পূর্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈঋত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্থীতে পশ্চিমে, পূর্ণিমাতে বায়ু কোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশান কোণে যোগিনী বিরাজ করেন।সাধারণত এসময় যাত্রা অমঙ্গলজনক বলে বিশ্বাস করা হয়।

চিত্রঃ যোগিনী তারা

কন্যাকুমারী

দেবী পার্বতীর আরেক রূপ কন্যাকুমারী। জাদুঘরের বর্ণনানুসারে – মূর্তিটি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকেতৈরি। প্রাপ্তিস্থান – তাড়াস, সিরাজগঞ্জ।[৩৬]দক্ষিণ ভারতে বহুপূর্ব থেকেই কন্যাকুমারীরূপে দেবীর পূজা করা হয়। আবার কেউ কেউ দেবী কুমারী বলেও স্তুতি করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় ভাষায় তাঁকে আম্মান নামে ডাকা হয়। দেবী রূপে অপরূপা। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে দেবাদিদেব মহাদের তাঁকে বিয়ে করেন। ভারতের দক্ষিণ সীমান্তে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের মিলন স্থানে বিখ্যাত কন্যাকুমারী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ভক্তগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দেবীর পূজা করে থাকেন। তবে ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে দক্ষিণ ভারতেই বিশেষভাবে কন্যাকুমারী দেবীর পূজা প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋজু ভঙ্গিমায় অত্যন্ত নান্দনিকভাবে মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে। এখানে দেবীকে বন্দনারত অবস্থায় দেখা যায়। মাথার নিচে উপাধান এবং পদ্মের উপর দণ্ডায়মান।বাংলাদেশে দেবীর মূর্তি পাওয়ার বিষয়টি বিরল ঘটনা।

চিত্র:কন্যাকুমারী

উপসংহার

হিন্দুধর্মীয় দিক থেকে এই দেবদেবীর ভাস্কর্যগুলোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ভাস্কর্যগুলোমহাস্থানগড়ে থাকায়পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসেগুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।২০১৬ সালেমহাস্থানগড়কে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত পর্যটকগণ এ অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন। এখানে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে চল্লিশটিরমতো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। বগুড়ার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান মহাস্থানগড়ছাড়াও হিন্দু দেবদেবীর ভাস্কর্য উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে মহাস্থানগড় জাদুঘরেহিন্দু দেবদেবীর বিভিন্ন ভাস্কর্যের বিপুল সমাহার প্রত্যক্ষ করা যায়। এগুলো হিন্দুধর্মের পুরণো ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।ভাস্কর্যগুলো তৈরিতে ঐঅঞ্চলের মানুষের যেমনশিল্প মানসের পরিচয় মেলেঅপরদিকে ভক্তিমার্গের বিষয়টিও অনুধাবন করা যায়। এখানেখ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের তৈরি ভাস্কর্যগুলো সংরক্ষিত আছে। এ সমস্ত দেবদেবী বৈদিক, পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতা হিসেবে স্বীকৃত।*বেদ*, *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর দেবতা বৈদিক দেবতা, *পুরাণে* আলোচিত পৌরাণিক দেবতাএবং *বেদে* ও *পুরাণে* উল্লেখ নাই কিন্তু জনসাধারণ স্থানীয়ভাবে অঞ্চল বিশেষেপূজা করে আসছে তাঁরালৌকিক দেবতা হিসেবে স্বীকৃত। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পূজার নিমিত্তে মন্দিরে এবং গৃহে দেবদেবীর ভাস্কর্য তৈরি করে পূজা করতেন। প্রাচীন বাংলার হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের পরম পূজনীয় বিষয় হিসেবে এই দেবদেবীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'মন্দির' প্রবন্ধে বলেছেন – মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সুখ-দুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, উহা নব হিন্দুধর্মের মর্মকথা হয়ে উঠিল।[৩৭]ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দু জনগোষ্ঠীর আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টিও জড়িত ছিল। এগুলোর নির্মাণ উপকরণ দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, ভাস্কর্যগুলো তৈরিতে বেশ অর্থ ব্যয় হতো। তবে ক্ষেত্র বিশেষে বিত্তবানদের ও রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। রাজারা স্বাভাবিকভাবে প্রজাসাধারণের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান জানাতে ভাস্কর্য তৈরিতে অনুদান প্রদান করতেন। অনেক ক্ষেত্রে মন্দিরের জন্য ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। তাঁরা ভাস্কর্য রেখে পৌরোহিত্য করতেন।মহাস্থানগড় জাদুঘরের সংরক্ষিত ভাস্কর্যগুলোর ধর্মীয় গুরুত্বের সাথে সাথে বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্রিক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দেশ-বিদেশের পর্যটক ও গবেষকরা এই জাদুঘরের দেবদেবীর ভাস্কর্য থেকে প্রাচীন বাংলার নানাবিধ বিষয় এবং হিন্দুধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। এভাবে নানা বিষয়ে সমাজের মানুষের উপর দেবদেবীর ভাস্কর্যসমূহের ধর্মীয় সাধনা ও অনুষ্ঠানের গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। যা বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুপম মহিমা প্রকাশ করে।

তথ্যনির্দেশ

১. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৪, পৃ. ১৩৩৯

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রথম খণ্ড,কলকাতা, ১৯৮২,পৃ. ১৮

৩. R.C. Majumder, *History of Bengal,* The university of Dhaka, 1976, p. 20

৪. দিনেশ চন্দ্র সরকার, *পালপূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৪৭

৫. Sir Alexander Cunninggham, *Archaeologycal Survey of India,*Vol. xv. p. 103

৬. আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৭৫

৭. নাজিম উদ্দিন আহম্মেদ, *মহাস্থান, ময়নামতী, পাহাড়পুর*, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা, ১৯৯ পৃ. ২

৮. কালিদাস ভক্ত, *ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা*, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র,*প্রবন্ধাবলী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ম, খন্ড, জুলাই ২০১৮, পৃ.৪২

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, শান্তিনিকেতন, ভারত, ১৯৩৫, পৃ. ৯৫

১০. মোঃ মোশারফ হোসেন, *হিন্দু জৈন বৌদ্ধ মূর্তিতাত্ত্বিক বিবরণ, (পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ)*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৭

১১. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী*, উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, প্রথম পর্ব, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৩৪

১২. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১১৭, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৭

১৩. কালিদাস ভক্ত, *ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৪. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৩৫২, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৮

১৫. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ০১, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৪১

১৬. কালিদাস ভক্ত, *ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৭. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১২৫৪, প্রদর্শনী গ্যালারী – ১

১৮. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ২৩৪৭, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৯

১৯. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর , প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৯

২০. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩০

২১. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১২৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩১

২২. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর, প্রদর্শনী প্রদর্শনী গ্যালারী – ১

২৩. কালিদাস ভক্ত, *ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

২৪. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১১৯, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৫

২৫. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৭২৫, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৫

২৬. কালিদাস ভক্ত, *ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

২৭. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ০৯, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৬

২৮. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ২৮, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৬

২৯. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৫৪, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৮

৩০. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৫, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৪০

৩১. কালিদাস ভক্ত, *ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৩২. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ৩১, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৮

৩৩. কালিদাস ভক্ত, *ময়নামতি জাদুঘরে সংরক্ষিত ভাস্কর্যে হিন্দু দেবদেবী : একাটি পর্যালোচনা*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৩৪. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১৩৫৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ১৫

৩৫. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১১২৯, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ২৬

৩৬. মহাস্থানগড় জাদুঘর, সংরক্ষণ নম্বর ১০৭৩, প্রদর্শনী শোকেস নম্বর ৩৪

৩৭. *প্রাগুক্ত*,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, পৃ. ৯৪